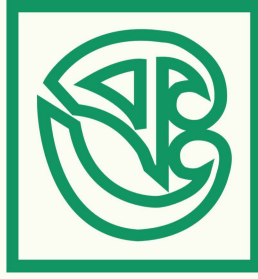


মহাগণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ বিরচিত

# ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতন

শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাশয়ের অনূদিত



## কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখে লাখে মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

# স্মৃতি-তপ' ৭

“সম্মা মগ্গং পদস্, সকা অসেস ক্কাণদায়কা”

আমার পরমাত্মা আচার্য-উপাধ্যায়গণ

এবং

সাঁদের পবিত্র সাহচর্য লাভে জীবন ধন্য

তাঁদের পুণ্য স্মৃতি স্মরণে

- উপনয়নরাজ — শ্রী-শ্রীমৎ গুণালঙ্কার মহাহুবির  
মহা পণ্ডিত — “ ” বর্মাধার “  
পরম পূজা — “ ” বংশদীপ “  
“ ” — “ ” প্রজ্ঞাবল “  
বিশ্বনাথচার্য — “ ” আর্ষ বংশ “  
সাধক প্রবর — “ ” আবল্য মিত্র “  
. আর্ষশ্রাবক ভাবনাচার্য — শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মুংসদ্বি  
জ্ঞাব তাপস — “ ” রাসমোহন চক্রবর্তী  
মহোদয় পণ্ডিত — শ্রীযুক্ত শীলাবল্য ব্রহ্মচারী  
. অধ্যাপক — ভট্টের জিহাবল্য বড়ুয়া

আপনাদের স্নেহাস্পদ —

শ্রী জ্যোতিঃ পাল মহাশয়ের

ভাৰতে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ উত্থান-পতন  
অনুদিত—ঐ জ্যোতিঃ পাল মহাথৰ

## BHARATE BOUDDHA DHARMER UTTAN O PATAN

### RISE AND FALL OF BUDDHISM IN INDIA

Translated by  
Ven. Jyoti Pal Mahathera

প্রকাশনায় :—

ডাক্তার অরবিন্দ বহুস্মার মাতৃদেবী  
ঐশ্বৰ্য্যী বিমলাময়ী বহুস্মা  
কোটের পাড়, চট্টগ্রাম

প্ৰথম মুদ্ৰণ :—

কৰ্প'ক্ল'নী (এস. বিউমার্কেট, কুমিল্লা)।

Reprinted and Donated for free distribution by  
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation  
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.  
Email: [overseas@budaedu.org](mailto:overseas@budaedu.org)  
Website: <http://www.budaedu.org>  
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.  
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

## পুণ্য-চূৰ্ণ

সৰ্বজন প্ৰিয় পুত্ৰ-চৰিত্ৰ সুযোগ্য বাটোৱা,

বৰ্গীয়া বামী — শ্ৰীমন্ত বড়ুয়া

অসীম গুণ-মাহাত্ম্য অৱশ্যে

পুস্তক প্ৰকাশজনিত

পুণ্যৱশি অৰ্পণ

কৰলাম ।

সহধৰ্ম্মিনী — শ্ৰীমতী বিমলাময়ী বড়ুয়া

## শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৮	মোগ্গনি	মোগ্গলি
৪	১৬	ত্রিপিটক	ত্রিপিটক
৪	১৮	সৌধ	মৌধ
৫	২	হয়	প্রকাশিতহয়
৫	১৫	মহাসস্তিক	মহাসাংঘিক
৫	২০	অবস্থাপনপূর্বক	অবস্থানপূর্বক
৭	১১	এস্থ	এস্থ
৭	১৬	ষাপের	ষানের
৭	২২	মহাসাংঘিক	মহাসাংঘিক
১২	১৮, ১৯, ২	কুমারিণ	কুমারিণ
১৬	১২	গহস্ত	গৃহস্থ
১৬	২০	দেওয়ান	দেওয়ান
১৬	২৩	ধ্বংসীভূত	ধ্বংসীভূত

## প্রাক-কথন

৪	২৫	হের-কালে	হের জ্ঞানে
৬	২৪	বিশ্বয়	বিশ্বয়
৯	১৫	অদ্যান্য	অন্যান্য
১০	১০	অন্তর্ভূত	অন্তর্ভূত
১০	২০	রাহজী	রাহুলজী

## প্রাক-কথন

ছোট কালে কলকাতা অবস্থানকালীন বিশ্ব-বিখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকু-  
তায়নকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকলেও আজ তাঁকে যতখানি  
বুঝেছি, তখন ততখানি বোঝা সম্ভবপর হয় নি। তিনি ছিলেন তথাগত  
বুদ্ধের অনুসারী ভিক্ষু। ভীক্স প্রতিভা-মা' ওত দেহ-কাস্তি দেখে তাঁকে বুদ্ধের  
প্রকাশ বলেই আমার চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর চরিত্র চিত্রণ এসঙ্গে  
যদি বলি, তবে বলতে হয়,—তিনি ছিলেন সত্যত প্রশান্ত, সৌম্য ও সুধীর।  
তাঁর দৃষ্টি ছিল বিশ্ব-জনীন। বিশ্বের মানব সমাজে তিনি এক চির-ভাষ্যর  
স্বর্ণ-তারকা। বিশ্বের সমুদ্রত দেশগুলোর মধ্যে খুব কম দেশই আছে, যে  
দেশে রাহুলজী জ্ঞান সন্ধানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন নি। রাহুলজীর জীবনে  
ধর্ম-নীতি, রাজনীতি ও সমাজ-নীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ধর্ম,  
সংস্কৃতি, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ ও রাজনীতি  
সম্পর্কিত : ৫০টি গ্রন্থের প্রণেতা। তা ছাড়া, বারবার তিব্বত গমন-পূর্বক  
তিব্বত থেকে ছোট বড় প্রায় সাড়ে তিন শত পুঁথি সংগ্রহ করে  
এনেছেন। তন্মধ্যে এমন সব অমূল্য সম্পদও রয়েছে, যা তাঁর জীবদ্দশায়  
প্রকাশ করার সুযোগ পান নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায়  
তাঁর প্রণীত বহু গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। তাঁর আবির্ভাব, সৃজন-সাফল্য  
ও আবিষ্কারকে বিশ্বের বিদ্বদজন সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী অপার অঙ্কা  
ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে থাকবেন।

আমি আগ্রহ করে রাহুলজীর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ আমাদের গ্রন্থাগারের  
জগু সংগ্রহ করেছি। তন্মধ্যে বিম্বকের মত চিত্রণ মাত্র দশ পৃষ্ঠার একটি  
পুস্তিকা—“ভারত মে বৌদ্ধ ধর্মকা উত্থান ওর পতন”। ইহা হিন্দি ভাষায়  
লিখিত। এই পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো—যে ধর্ম তৎকালীন বৃহত্তম  
ভারতের সমগ্র অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল, যে ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা আজও  
বিশ্বের মানব জাতির মধ্যে বৃহত্তম, এরূপ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী যে বৌদ্ধ

বর্ষ আপন মাতৃভূমি ভারত-বর্ষে কেন এত সহসা বিলুপ্ত হয়ে গেল ?—এ’টা আশ্চর্যজনক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর ভিত্তি করে রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতন সম্পর্কিত বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

এই পুস্তিকার কতক শব্দ-সংযোজন ও বিষয় বস্তুর অবতারণা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। আমি সেই বিতর্কের কিছুটা নিরসন করার চেষ্টা করব। রাহুলজী পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,—“এই ধর্মের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শীগণ হাজার হাজার বর্ষ-ব্যাপী সম্ভাব্য পর্বত-বন্ধকে মোমের মত কর্তন করে অজাস্তা, ইলোরা, কাল্‌ ও নাসিক প্রভৃতি গুহা মন্দিরগুলো যেই অত্যাশ্চর্য-ভাবে প্রস্তুত করেছেন, তার গম্ভীর তাৎপর্য অবগত হওয়ার জন্য যখন ও চীনাাদের মত সমুদ্রত জাতি আগ্রহান্বিত হয়ে ছিলেন”। তৃতীয় পৃষ্ঠায়—“মৌর্য সাম্রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার পর যখন-রাজ মিনান্দ্র পশ্চিম ভারত অধিকার করেছিলেন। যখন রাজারা অধিকাংশ বৌদ্ধ ছিলেন”। চতুর্থ পৃষ্ঠায়—“যখন দিগকে পরাস্ত করে শকেরা পশ্চিম ভারত অধিকার করলেন”। একেত্রে যখন শব্দটির সম্পর্কে কতক তত্ত্ব-মূলক আলোচনার প্রয়োজন।

পালি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের খাডু-কোষে যু খাডুর নিম্পন্ন শব্দ যবতীতি যবন - অর্থাৎ আগমনপূর্বক মিলিত হয় বলে যবন।

মানব-সভ্যতার বিচারে গ্রীক-জাতি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্য জাতি। খ্রীষ্ট যুগের জন্মের বহু কাল পূর্বেই গ্রীক জাতি সভ্যতার চরমে পৌঁছেছিলেন। বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিদ্যায়। তাদের অপূর্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিদ্যাই তাদের তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি ও শিল্প-চাতুর্যের নিদর্শন। গ্রীস দেশের অন্তর্গত একটি উপনিবেশের নাম আইয়োনিয়া ( Ionia )। এর সংক্ষিপ্ত রূপ - আয়োনা। এই আয়োনা শব্দই ভারতীয়দের মুখে ‘আ’ হ’ল অন্তস্থ ‘য’, যো হ’ল—অন্তস্থ ‘ব’, এবং ন ঠিকই রইল। কালক্রমে আয়োনা শব্দের অপভ্রংশে যবন হয়ে গেল। এই আয়োনা উপনিবেশের অধিবাসী গ্রীক-দিগকে যবন জাতি, তাদের দেশকে যবন দেশ এবং তাদের



লিপিকে যবনানি বলি হত। এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত উইলসন সাহেবের মতে—বাহলিক বা ব্যাক্টিয়া থেকে আয়োনা পৰ্গন গ্রীক উপনিবেশের অধিবাসী গ্রীক-দিগকে ভারতীয়রা যবন ও তাদের লিপিকে যবনানি বলত। তথাগত বুদ্ধের বিশ্ব-প্রেমী ধর্ম বিদেশী-হিসাবে এই যবনগণকেই সর্বপ্রথম আকৃষ্ট করেছিল। যবনেরা ভারতে এসে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ব্যবসায় বাণিজ্য, রাজত্ব প্রভৃতির সাথে আপন সত্তা সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে ফেলে ভারত-বর্ষকে স্বদেশ রূপে মেনে নিয়েছিলেন। এর স্বপক্ষে বহু প্রমাণই রয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখা যায়, —খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য দেশ বিদেশে যে সব ভিক্ষুকে পাঠিয়েছিলেন,—তন্মধ্যে যবন মহারক্ষিত ও যবন ধর্মরক্ষিত যবন প্রদেশে বা যোনক ব্যাক্টিয়া ও আয়োনায় গিয়ে-ছিলেন। যবনেরা কোন্ সময় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তা' সঠিক জানা না গেলেও সম্রাট অশোকের সময়ে তা বটেই—তার পূর্বেও যবনগণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যবন মহারক্ষিত ও যবন ধর্মরক্ষিত স্থবির যে যবন দেশ-জাত, তা সহজে অনুমেয় এবং তাঁরা যে সম্রাট অশোকের পূর্বকার তাও নিশ্চিত। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পর বহু দিন ব্যাপী বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে জ্ঞান উপার্জন করেছিলেন, যদ্বারা তাঁরা স্বদেশে বা অন্যদেশে ধর্ম প্রচারক রূপে প্রেরিত হবার যোগ্য বিবেচিত হলেন। অশোকের জন্মের মাত্র ৬৩ বৎসর পূর্বে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ঘটনা ঘটে। তখনও অসংখ্য গ্রীকের ভারতে আগমন হয়। তারাও ভারতীয়দের নিকট যবন নামে পরিচিত। ভারতীয় গুহা-মন্দিরগুলোর চিত্রের পাশে দাতার বা চিত্রকরের নাম খোদিত আছে। প্রত্যেক নামের পূর্বে যবন শব্দটি রয়েছে। নামগুলো ভারতীয় হলেও যবন দেশ-জাত লোক বলে প্রত্যেক নামের পূর্বে যবন শব্দ রয়েছে। নচেৎ ভারতীয়দের নামের পূর্বে যবন শব্দ থাকবে কেন? বস্তুতঃ ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যবন বৌদ্ধদের অবদান অতুলনীয়। বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিদ্যার সর্বপ্রথম প্রবর্তন যবন বৌদ্ধগণ দ্বারা। পাক্কার দেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিল্পগুলো গ্রীক ভাস্কর্যের সুন্দরতম নিদর্শন। ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে—বৌদ্ধ শিল্পকলা

যে আজ বিশ্বের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে—যবন বৌদ্ধদের অবদান তাতে অনস্বীকার্য ।

খৃঃ পূঃ ১২৫ অব্দে মিলিন্দ প্রশ্ন নামে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয় । গ্রীস দেশীয় রাজা মিনান্দ্র ও মহাস্থবির নাগসেনের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের বিতর্কিত জটিল বিষয় নিয়ে প্রশ্নোত্তরসহকারে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা-ই পরবর্তী কালে মিলিন্দ প্রশ্ন নামে অভিহিত গ্রন্থ । এই গ্রন্থের সর্ব-প্রথমে সাকলা..... ( বর্তমান সিয়ালকোট ) নগরের বর্ণনায় যবন শব্দের উল্লেখ আছে । সাকলানগর যবনদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ও রাজা মিনান্দ্রের রাজধানী ছিল । তাঁর রাজত্ব কাল খৃঃ পূঃ ১৪০-১১০ অব্দ । বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, যে দিন যবন-রাজ মিনান্দ্রের সাথে নাগসেনের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ ঘটে এবং বিতর্ক আরম্ভ হয়, সে দিন রাজা মিনান্দ্রের সঙ্গে পাঁচ শত যবন উপস্থিত ছিলেন ।

শকদের ভারতে আগমন কাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক । শকদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাকটিক ও আয়োনা নিবাসী গ্রীক রাজারা পশ্চিম ভারতে বহু কাল রাজত্ব করেছিলেন । এই গ্রীক রাজারা সবাই বৌদ্ধ ছিলেন । এ জন্ত রাহুলজী বলেছেন—যবন রাজারা অধিকাংশ বৌদ্ধ ছিলেন এবং যবনদিগকে পরাস্ত করে শকেরা পশ্চিম ভারত অধিকার করেছিলেন । পৌরাণিক পালি-সংস্কৃত গ্রন্থে যবন শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । সেই প্রয়োগে কারো প্রতি হেয়-জ্ঞান ছিল না, ছিল সম্মান-সূচক ব্যবহার । রাহুলজীও যবন শব্দটি উন্নত জাতি ও দেশ-ভিত্তিক শব্দ-রূপেই ব্যবহার করেছেন । কোন জাতি বা ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তুচ্ছ-তাম্বিল্য জ্ঞানে ব্যবহার করেন নি । পরবর্তী কালে যবন শব্দটি বিদেশী আক্রমণকারী ও অত্যাচারী দলের প্রতিও ব্যবহৃত হয়েছে । এমন কি, বহু শতাব্দী পর কোন বাংলা সাহিত্যের কাব্য ও উপন্যাসে গ্রন্থে বিশ্বাস ঘাতকতার উপলক্ষ্যে পশ্চিম দেশীয় মুসলমানের সাথে নিজ দেশীয় মুসলমানকেও হেয়কালে যবন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । বাংলা বিশ্ব-কোষ-অভিধানে যবন শব্দের অর্থ একরূপ বিভিন্ন রূপেই করা

হয়েছে। বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়-বহুল দেশে একে অন্তের প্রতি কত রকমের শব্দ যে হয়-জ্ঞানে ব্যবহার করে থাকে,—তার ইয়স্তা নেই। পণ্ডিতকে গালিচ্ছলে অস্ম শব্দ ব্যবহার করলে কিংবা অস্মকে বাঙ্গ করে পণ্ডিত বললে মনোক্ষুণ্ণতার সৃষ্টি করা যায় বটে; কিন্তু মৌলিক স্বাভাবিক শব্দের অর্থ-বৈকল্য ঘটান যায় না। ইহাতে আপন কলুষিত মনোভাবেরই পরিচয় হয় এবং সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বিষ ছড়ান হয় মাত্র। বৌদ্ধ বিনয়-বিধানে আছে,—কোন মানুষের প্রতি বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় বা জাত ধরে সাধারণ কথা বলাও অপরাধ, যেহেতু এক্ষেত্রে মানবতা-বিরোধী ভেদ-বুদ্ধির আভাস আছে। হয়-জ্ঞানে যাঁদেরকে বলা হয়েছে—যবন, পরম যত্ন ও গৌরবের সাথে তাঁদের ধর্ম-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, লিখন ও ভাষান্তর কার্ণে সারাটি জীবন অতিবাহিত করতেও দেখা গিয়েছে। যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে চোর বলে কটুক্তি করা হয়েছে, সেই শাস্ত্রেই আবার বুদ্ধকে পরমাস্থার অবতার রূপে মেনে নিয়েছেন। জগতে এরূপ নিন্দা-প্রশংসার দুই বিপরীতমুখী ভাব-ভাষার অভাব নেই। আমাকে নিন্দা করে বলেই আমি দুঃখিত হই, এই আমাকেই তো অনেকে প্রশংসা করে থাকে। আজ আমাকে প্রশংসা করল বলে আমি আনন্দে বিহ্বল হই কেন, এই আমাকেই আবার অনেকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করে থাকে। এরূপ তুলা-দণ্ডে সাম্য, সৌম্য ভাব রক্ষা করাই পৌরুষের।

এই উপমহাদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, বৈদিক জ্ঞান কাণ্ডের প্রবর্তক “শঙ্করাচার্যই ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণ”। ইহা শুধু জনশ্রুতি নহে, শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে।—

আসেতোরা ভুবারাজে বৌদ্ধানা বুদ্ধ বালকম্।

ন হস্তি যঃ স হস্তব্যো ভৃত্যানিত্যম্ শাস্ত্রপূঃ ॥

অর্থাৎ উড়িষ্যার রাজা সুধর্ম শঙ্করাচার্যের প্ররোচনায় অবৌদ্ধ প্রজাগণের শ্রুতি এই আদেশ প্রচার করলেন যে, সেতু-বন্ধ রামেশ্বর হতে হিমাদ্রির মধ্য-বর্তী বিশাল সাম্রাজ্যে যত বৌদ্ধ আবালবৃদ্ধবণিতা আছে, সব হত্যা কর, যে হত্যা করবে না,—তাকে হত্যা করা হবে। এই আদেশের তৎপরতার

বৌদ্ধেরা সব ধ্বংস। পক্ষান্তরে, শঙ্করের বিরুদ্ধ-বাদী এক শ্রেণীর ভারতীয় লোক প্রচার করতেন যে, “মায়া বাদং অসং শাস্ত্রম্ প্রচ্ছন্নম্ বৌদ্ধমেব চ” মারাবাদ নামে যে অসং শাস্ত্র শঙ্করাচার্য কতৃক প্রচারিত হচ্ছে,—বস্তুতঃ তা বৌদ্ধ মতবাদ। শঙ্করাচার্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আবার দেখা যায়,—শঙ্করাচার্যের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে যেই প্রাণঢালা অঙ্কা, আবেগ ও অর্চনা জ্ঞাপন করেছেন,—তা অপূর্ব। তিনি বলেছেন,—

ধরাবদ্ধ পদ্মাসনাং ত্রি বষ্টিঃ

নিয়মানিলং ন্যস্ত নাসাগ্রদৃষ্টি।

যঃ আশ্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী

স বুদ্ধ প্রবুদ্ধ’স্ত নঃ চিত্তবর্তী ॥

অর্থাৎ যিনি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়ে মহীমণ্ডলে প্রাণায়াম সাধনা করে নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক পদ্মাসনে উপবিষ্ট, যিনি যোগীবৃন্দের অগ্রগণ্য যোগীমূলে কলিযুগে অবতীর্ণ; সেই বুদ্ধ আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হউন। অথচ শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে দুই বিপরীতমুখী অপবাদ প্রচলিত এবং তথাগত বুদ্ধের যেতি তাঁর স্বীয় রচনা হল—এই। আসল কথা,—শঙ্করাচার্যের জন্ম স্থান কেরল প্রদেশ ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ ও উদীচ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দীর্ঘ দিন ব্যাপী সামাজিক বিবাদ ছিল। আনন্দ গিরি ও মাধবাচার্য প্রভৃতি উদীচ্য ব্রাহ্মণগণের বিবদমান মনোভাবেই শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে এসব শাস্ত্রের প্রয়োগ ও অপবাদ রচিত হয়েছে।

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব কাল ৬৭৭—৭২০ খৃষ্টাব্দ। তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী কালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যগণের রচিত গ্রন্থে, তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের ভারত কাহিনীতে, চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারতবিবরণে, সিংহলে প্রণীত বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস মহা বংশে, দীপ বংশে কিংবা বার্মায় প্রণীত বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস—শাসন বংশের কোথাও শঙ্করের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম পতনের জন্ত কোনরূপ উদ্ধৃতি নেই। বড়ই বিস্ময়কর বিষয় যে, যদি সত্যি ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপের জন্ত শঙ্করাচার্য দায়ী

ধাকতেন তবে পরবর্তী কালের এতগুলো বৌদ্ধ লেখার মধ্যে ঘূনাকরেও কি কোন উল্লেখ থাকত না? বস্তুতঃ এ সব অপবাদ সত্য নহে। এ দ্রষ্ট্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন ঐতিহাসিক প্রমাণ ও নানা যুক্তি-তর্কে শঙ্করকে বৌদ্ধ ধর্ম বিলোপের অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন।

রাহুলজী পুস্তিকার নবম পৃষ্ঠায় লিখেছেন,—“গৌড়াধিপতি তো পশ্চিম দেশীয়দের বিহার-বাংলা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম ও শিল্প কলার সংরক্ষক ছিলেন”। এক্ষেত্রে গৌড়াধিপতি সপ্তম শতকের রাজা শশাঙ্ক হওয়াই সম্ভব। যেহেতু এই উদ্ধৃতির পূর্বাপর প্রসঙ্গ সপ্তম শতকেরই চলতেছিল। তা হলে রাজা শশাঙ্কের সম্পর্কে যে অনুরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, আশা করি এক্ষেত্রে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কর্ণ সুবর্ণের ( বর্তমান মুন্সিদাবাদ ) রাজা শশাঙ্ক “বৌদ্ধ ধর্মের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন”। রাজা শশাঙ্ক যখন কর্ণ সুবর্ণের রাজা, তখন হর্ষ-বর্দ্ধন শীলাদিভ্য থানেশ্বরের রাজা ছিলেন। উভয়ের রাজত্ব কাল সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ। যখন পরস্পরের মধ্যে ভীষণ রাষ্ট্রীয় বিরোধ চলতে ছিল, এমন সময় চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং বৌদ্ধ ধর্মের পীঠ স্থান ভারত ভ্রমণে এসে হর্ষ বর্দ্ধনের রাজ সভায় উপস্থিত হন। হর্ষবর্দ্ধন তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন-পূর্বক থানেশ্বরে অবস্থানের অমুরোধ জানানেন। হিউ-এন সাং এখানে বসে তাঁর বিবরণে লিপিবদ্ধ করলেন যে “গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ঘোরতর বৌদ্ধ বিরোধী”। অতঃপর হিউ-এন সাং ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণে যখন উপনীত হলেন, তখন রাজা শশাঙ্ক জীবিত ছিলেন না। এখানে তিনি বেশ কিছু কাল অবস্থান করে লিপিবদ্ধ করলেন যে, কর্ণ-সুবর্ণে ১০টি বিহার সম্ভারামে হুঁ হাজারের উপরে ভিক্ষু ভ্রামণ সুখ-শান্তি সহকারে ধর্ম চর্চার নিরত আছেন। তিনি বর্ণনা করলেন,—কর্ণ-সুবর্ণের সামাজিক সৃষ্ট রীতি-নীতি, মানুষের সুসংযত আচার ব্যবহার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাহিনী। এমন কি, খোদ রাজা

শশাঙ্কের ও ভূয়সী প্রশংসা করতে কুষ্ঠাবোধ করেন নি। এক্ষেত্রে হিউ-এন সাংয়ের উদ্ধৃত একটি মজার গল্প বড় প্রতিধানযোগ্য।

দাক্ষিণাত্যের এক অতি বিজ্ঞ দাস্তিক পণ্ডিত কর্ণ-সুবর্ণে এলেন। পরণে ছিল তাঁর বিচিত্র পোষাক। তাঁর মাথায় বাঁধা থাকত একটা জ্বলন্ত মশাল। তাঁর পেটটা থাকত তামার পাত দিয়ে বাঁধা। হাতে একটা পাকাও লাঠি নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বুক ফুলিয়ে কর্ণ-সুবর্ণে ঘুরে বেড়াতেন। লোকে প্রশ্ন করলে বলতেন, অজ্ঞানাত্মকায় যারা দুনিয়ায় পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদেরই পথ প্রদর্শনের জন্য তাঁর মাথায় মশাল ধারণ আর অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞানের চাপে পেট ফেটে যেতে পারে—এই ভয়ে তামার পাতের পেট বন্ধনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এখনবরে রাজা শশাঙ্ক বিন্মিত হয়ে দাস্তিক পণ্ডিতকে শাস্ত্র-যুদ্ধে অবতীর্ণ করার মানসে তর্কের ব্যবস্থা করেছিলেন। দাস্তিক পণ্ডিতের সাথে তর্কে অবতীর্ণ হতে প্রথমতঃ কেউ রাজী হলেন না। অবশেষে তর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন তাঁরই রাজধানীর এক বৌদ্ধ ভ্রমণ : তর্ক-যুদ্ধে দাস্তিক পণ্ডিত বৌদ্ধ ভ্রমণের কাছে হার মেনে গেলেন। তাতে রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ ভ্রমণের প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হলেন এবং একটি সজ্জারাম নির্মাণ-পূর্বক বিজয়ী ভ্রমণকে দান করেছিলেন।

এতে বুঝা গেল যে, হিউ-এন সাং-এর পূর্ববর্তী উক্তি ও পরবর্তী বিবরণ কতকিঞ্চি সামঞ্জস্য-হীন। এতে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক নহে যে, পানেরশ্বরে পৌছার আগে যদি তিনি কর্ণ-সুবর্ণে পৌছতেন কিংবা শশাঙ্কের সাথে হর্ষ-বর্ধনের রাষ্ট্রীয় বিবাদ না থাকত তবে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে ঘোরতর বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী বলে কোন অপবাদ উঠত না। মহারাজ শশাঙ্ক সম্পর্কে বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্ঘ্য-কলাপের অপবাদ সচরাচর যা প্রচলিত, তা ঐতিহাসিক বিচারে অতিরঞ্জিত বলে বাংলাদেশী প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের প্রধান পরিচালক ডাঃ নাজিমুদ্দিন আহমদ মন্তব্য করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম-শাস্ত্র ও সাধন মার্গকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়,—খেরবাদ বা গীনযান, মহাযান ও তন্ত্র যান। খঃ পূর্ব বর্ষ শতক থেকে

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব পর্যন্ত—এই পাঁচ শতাব্দিক বংসর হীন-বানের অভ্যুদয় কাল। খৃষ্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই সাত শত বংসর মহাযান পন্থী বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রতিপত্তি এবং অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক—এই পাঁচ শত বংসর তন্ত্র বানের প্রাচুর্ভাব কাল নিরূপিত হয়েছে। এই ত্রিবিধ বানেরই বিরাট সাহিত্য, সাধক পরম্পরা ও কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব। হীনযানী বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র পালি ভাষায় এবং মহাযানী ও তন্ত্রবানী শাস্ত্র গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

রাহুল সাংকৃত্যায়ণের মতে—ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ সাধন ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে আরম্ভ হলেও তার কারণ গড়ে উঠেছে বহু কাল আগের থেকে। বৈশালীর দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর থেকে বৌদ্ধ ধর্মে বহু মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় অনুসারীরা বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কনিষ্কের আমল থেকে মূর্তি গড়া আরম্ভ হয়। বুদ্ধ বোধিসত্ত্বকে মানব সত্ত্বারূপে না মেনে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করা হল। বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের জীবনাদর্শের সাধনা ছেড়ে দেবতা-জ্ঞানে তাঁদের পূজার্চনা শুরু হল। তা ছাড়া, অসংখ্য দেব-দেবতার সৃষ্টি করে অগাশ্র ধর্মের উপাস্য দেব-দেবতার সংখ্যা অতিক্রম করে ফেলল। জীবন দুঃখের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ-প্রদর্শিত সাধন-মার্গ পরিত্যাগপূর্বক পূজার্চনার নানা বিধি আবিষ্কার করল এবং মহা ধুমধামে পূজার্চনা আরম্ভ হয়ে গেল। বোধি-জ্ঞান, নির্বান মুক্তি কঠোর সাধন-সাপেক্ষ রইল না। পূজার্চনার মাধ্যমে নির্বান-মুক্তি মূলত সহজ সরল বলে বিবেচিত হল। মহাযান ও তন্ত্রবান বৌদ্ধ ধর্মে ধারনী, মঞ্জুশ্রী মূল কল্প, গুহ্য সমাজ, চক্র সংবর এবং তৎসম্পর্কিত ব্রত-স্চারণ, বলি-পূজা, পুরস্চরণ ইত্যাদি তপ-জপ ও তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছল,—যার ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক আদর্শ উৎপাটিত হয়ে বৈদিক ধর্মের পুনর্জাগরণের বিরাট সহায়তা করল। বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ ধরে রাখার মহান ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটল। এভাবে ধর্মের বিলোপ সাধিত হল।

অষ্টম শতাব্দীর থেকে চৌরাশি সিদ্ধার আবির্ভাব। শুধু চৌরাশি নহে, সংখ্যায় আরো কত শত সিদ্ধা, যারা উল্লেখ-যোগ্য, তাঁদের নাম একটা তালিকায় নিম্নবন্ধ হয়েছে। সিদ্ধাগণ অধিকাংশ বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁদের রচিত চর্যাপদ, দোহা, ছড়ায় যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করল, এ গুলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল উৎস বলে বাঙ্গালী শিক্ষাবিদগণ একবাক্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু রাহুলজী কতিপয় সিদ্ধাকে বিদ্বান প্রতিভাশালী কবি বলেও বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁদের অসংযত আচার নিষ্ঠা, জীবন-জীবিকা, রীতি-নীতি লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ আধা-পাগল নামেও আখ্যায়িত করেছেন। মূল পুস্তকে বর্ণিত পন্থী-পা, কমরী পা, ডমরু-পা ও ওখরী-পা প্রভৃতি সিদ্ধাগণ ও চৌরাশি সিদ্ধার অন্তর্ভুক্ত। যেই কর্ম-ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধাগণ পূবোক্ত নামে বিশেষিত, জন সাধারণের মধ্যে পরিচিত,—সেই কর্ম-ধারা আধ্যাত্মিক সাধনোচ্চিং নহে। শব্দ গুলোর ব্যুৎপত্তি-গত অর্থেই প্রমাণিত হয় যে, রাহুলজীর মন্তব্য যথার্থ। এই পা বা ফা শব্দটি আমাদের পারিপার্শ্বিক ত্রিপুর, আরকানি ভাষায় আছে—যার প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায়—পিতা বা বাবা। এ'টা কখনো নামের পরে, কখনো বা কর্মানুসারে পদবীর পরে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়,—যেমন, কাহু-পা, হাড়ি-পা, ( সিদ্ধাগণ ), রত্ন-কা, আচুঙ্গ-কা, (রাজা-গণ)। বস্তুতঃ পা বা ফা শব্দটি সম্মানসূচক সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ। আধুনিক জী শব্দ তুল্য,—যেমন, বাবা-জী, গুরু-জী, স্বামী-জী, মহাত্মা-জী।

রাহুলজী একচেটিয়া কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় কিংবা জাতির উপর দোষা-রোপ করেন নি। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি ও অবনতি সম্পর্কে সন-শতক-সহকারে ও ধারাবাহিকভাবে কে সব যুক্তি ও কারণ বিশদরূপে বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণনাই সঠিক বলে পণ্ডিত মহলের বিশ্বাস। তাঁর বর্ণনার অন্তর্নিহিত মর্মার্থ হল,—তথাগত বুদ্ধ কঠোর সাধনায় বোধি-জ্ঞান লাভ করে যে ধর্ম প্রবর্তন করলেন, তাঁর মহাজ্ঞানী শ্রাবক সজ্জ চরিত্রের গান্ধীর্থে, কঠোর জ্ঞান সাধনায় সে ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। বহু শতাব্দী পর যখন বৌদ্ধ ধর্মে বড় মতবাদের সৃষ্টি হল ? অনুসারীগণ শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে



গেল, বিশেষ করে, হীন, নীচাশয়, দুর্নীতি পরায়ন, অত্যাচারী ভিক্ষু নাম ধারীদের বুদ্ধের ধর্ম-শাসনে আগমন হল, বাহ্যিক ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হল, হিংসা হত্যা লুণ্ঠনের তান্ত্রিক লীলা সংঘটিত হল, তখনই বৌদ্ধ ধর্ম আপন জন্মভূতি ভারত বর্ষ হতে নির্বাসিত হয়ে গেল।

এ জগৎ কার্য-কারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিনা কারণে কোন কাজ হয় হয় না। একটি কাজ সংঘটিত হবার পেছনে বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। শুধু একটি কারণে একটা কাজ সিদ্ধ হয় না। অনুকূল কারণে গড়ে ও প্রতিকূল কারণে ভাঙ্গে। বৌদ্ধ ধর্মের বেলায়ও এই নীতি অপ্রযোজ্য নহে। একটি গৃহ খুঁটির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে ও স্থিত থাকে। খুঁটি যতদিন মজবুত থাকে, ততদিন ঘূর্ণিঝড়েও পতিত হয় না। খুঁটি নষ্ট হয়ে গেলে সামান্য বাতাসেও গৃহ চূড়ম্বার হয়ে যায়। বাতাস এখানে গৃহ পতনের মূল কারণ নহে, উপসর্গ মাত্র। বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা ভারতে তা-ই হল।

কত কত লেখক নিজেকে বা নিজের সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে “উদোর পিণ্ডি বুদ্ধের ঘাড়ের”—একে অস্ত্রের উপর দোষ চাপিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপের কারণ নির্দেশ করেছেন,—যেমন অতীতে, তেমনি বর্তমানে। সম্প্রতি জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক সম্পাদিত “ওপি-চন্দ্রের সম্রাস” নামক গ্রন্থ বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। যাকারিয়া সাহেব বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপের একটা নূতন কারণ উদ্ভাবন করেছেন। গ্রন্থের পঁচা-নকশাই পৃষ্ঠায় লিখেছেন,—“এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় মরে গেছে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের সামান্ত এলাকা ছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব আর কোথাও নেই। এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির একটা প্রধান কারণ যে কর্ণ-সেন রাজাদের নির্ধাতন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরস নির্ধান বা শূন্যতাবাদী বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির বীজ যে সেই ধর্মের মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল—এ বুক্তি ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় না। বুনা নারকেলের ছোঁড়ো প্রাচীর ভেদ করে রস ও রসদ সংগ্রহ করা সবার

পক্ষে সম্ভবপর হয় না। নিরস বৌদ্ধ ধর্মের সাথে যখন মন্ত্রের বাহু-শক্তির সংযোগ ঘটল এবং পৌরানিক দেব দেবীরা তাদের যৌন-রসের কাহিনী নিয়ে আস্তানা গাড়ল, তাতে যে রসের আবির্ভাব ঘটল—তাতে নাথ ধর্মের বেঁচে থাকার পথ সুগম হল”।

বড়ই আশ্চর্য যে, বৌদ্ধ রাজা মহারাজা, ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক একটা বিরাটকায় গ্রন্থ দীর্ঘদিন ব্যাপী সম্পাদন করেও যাকারিয়া সাহেব বৌদ্ধ ধর্মে রসও পেলেন না, রসদও পেলেন না। তিনি বাংলাদেশের সামান্ত এলাকা ও স্বল্প সংখ্যক বৌদ্ধের প্রতি লক্ষ্য করেই বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব বিলোপের বিচার করলেন। কিন্তু বিশ্বের মানব জাতির বৃহত্তম সংখ্যা যে আজও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী—পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ ভূ-খণ্ড যে আজও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর অধ্যুষিত দেশ; সে দিকে তিনি মোটেই লক্ষ্য করলেন না। যাকারিয়া সাহেব যুক্তিতে বললেন—বৌদ্ধ ধর্ম নিরস; কিন্তু উপমায় বললেন—বুনা নারকেলের ছর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ ক’রে রস-রসদ সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। উপমা দ্বারা তিনি বৌদ্ধ ধর্মের রস-রসদ স্বীকার করলেন। তাঁর যুক্তি ও উপমা সামঞ্জস্যহীন। দিনাজপুর থেকে শ্রীবরদা ভূষন চক্রবর্তীর লিখিত একখানি পত্র যাকারিয়া সাহেব অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ বিবেচনা করে তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন; যেহেতু এই পত্রে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের মিথ্যা অবাস্তব কুৎসা বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধ ধর্ম বিলোপের যে নূতন কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন, তা নিতান্ত অযৌক্তিক অবাস্তব এবং বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক নীতির উপর প্রচণ্ড আঘাত। মৌলিক নীতির দোষারোপ রূপে যাকারিয়া সাহেবের উক্তি অপূর্ব। যাকারিয়া সাহেবের জানা থাকা উচিত যে, প্রচুর অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও সংস্কার মুক্ত বিচার-বুদ্ধি নিয়ে অল্প ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হলে নিছক অদূরদর্শিতার পরিচয় হয়। অনেক ক্ষেত্রে, তেঁতুল ও গুড় মিশ্রিত গুশ্ফতে অম্ব-রসের স্বাদ আশ্বাদন করা হয় মাত্র।

তথাগত বুদ্ধ ছয় বৎসর কঠোর সাধনা প্রভাবে উপলব্ধি করে ঘোষণা করলেন,—নিব্বানং পরমং সুখং, নিব্বানং অমতং পদং। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিশ্ব-বিখ্যাত যে সব গ্রন্থ রয়েছে, তার অধিকাংশ গ্রন্থ অবোদ্ধ মনীষী-বৃন্দের অক্ষয় অবদান। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির আলোচনা-গবেষণাকে সার। জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করে-ছিলেন। এই দৃষ্টান্ত আমাদের বর্তমান বাংলাদেশেও বিরল নহে।

বৈজ্ঞানিক যেমন কার্য-কারণের বিশ্লেষণ-পূর্বক জাগতিক প্রত্যেক ঘটনার বিশ্লেষণ করে থাকেন। কার্য-কারণের ব্যাখ্যা করে বাস্তবতাকে সঠিকভাবে প্রতিপাদন করাই বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য। অবাস্তব রস সংযোজনা করে সাধারণ লোকের মূল-বুদ্ধির খোরাক যোগান বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য নহে। বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য—একটা বস্তুর যথার্থ সত্য উপলব্ধি করে তৎ-সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। জ্ঞান লাভ হলেই মানুষের জীবনে গ্রাহ্য গ্রহণের ও তাক্যকে জ্যাগের জ্ঞান বিচার বুদ্ধি জাগে। তদ্রূপ তথাগত বুদ্ধও জীবন-প্রবাহের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কার্য-কারণ নীতিই প্রদর্শন করেছেন,—যা বৌদ্ধ শাস্ত্রে দ্বাদশ নিদান নামে অভিহিত। নীতির দিক দিয়ে যা কার্য-কারণ প্রবাহ; উপলব্ধি ও প্রচারের দিক দিয়ে তা-ই অনিত্য-দুঃখ-অনাস্রব্য কিংবা জগতের লাক্ষণিক সত্য। জীবন-রহস্যের উদ্বেগে এ'টাই হেতু-প্রত্যয়মূলক দার্শনিক সিদ্ধান্ত। বিশ্বের দার্শনিক মনীষীগণ বৌদ্ধ ধর্মের এই নীতিকে Most Logical Theory বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষ কি ভাবে জীবন-রহস্যের উপলব্ধিতে পরম শান্তি লাভ করে জীবন-দুঃখের অবসান ঘটাতে পারে, জীবন-প্রবাহ নিরুদ্ধ করতে পারে—এ'টাই হচ্ছে বুদ্ধের ধর্মের মূলদর্শ। তাতে অনাবশ্যক রস কল্পনা অবাস্তব।

কালের বিবর্তনে জগতের সব কিছু গতিশীল, পরিবর্তনশীল, উত্থান ও পতন-শীল। অনিত্যতা জগতের স্বাভাবিক ও অকাট্য বিধান। অনিত্যতার গর্ভে জগতের সব কিছুকেই একদিন বিলীন হতে হয়। এক সময় ভারত-বর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম সগোরবে প্রচার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রায় ছ'হাজার বছর

যাবৎ ছিল এর প্রবল প্রভাব প্রতিপত্তি । অতঃপর ভারত-বর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম ভিন্নিত হল বটে ; কিন্তু বহির্ভারতের সর্বত্র ধর্মের ব্যাপক অভ্যুদয় ঘটল । কবি বিজ্ঞেশ্বর লালের ভাষায়,—উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-হার, আজিও জুড়িয়। অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণতঃ চরণে তার ।

এ কথা একান্ত সত্য যে, মহাকালের এক মহান ঢেউয়ের পতনই আরেক মহান ঢেউয়ের পুনরুত্থানের উৎস । বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেমন অসীম, তেমনি পতনের রহস্যও ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ । জন-মানস থেকে সাময়িকভাবে অপসারিত হলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি । বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের সর্বত্র শিলা-লিপিতে, পর্বত-বক্ষে, তাম্র-শাসনে, স্থাপত্য—ভাস্কর্যে, শিল্পকলায়, সাগ্রহ শালায় ও সাহিত্য-সংস্কৃতি রূপে অক্ষয় স্মৃতি বহন-পূর্বক মহাকালকে জয় করে আছে । বর্তমান ভারত-বর্ষে ইতিহাসের এক নূতন দিক উন্মোচিত হয়েছে । ধর্মের পুনর্জাগরণ-ক্ষেত্রে দৈনন্দিন যেভাবে জন-প্রিয়তা ও জাতীয় মর্যাদা লাভ করে চলছে, তাতে নিঃসন্দেহে এই প্রতীতি জন্মে যে, বৌদ্ধ ধর্মের কালজয়ী অক্ষয় অবদানে আবার ভারতের ইতিহাসকে প্রভাবিত করবে ।

আমার বিদ্যা-বুদ্ধি অত্যন্ত সীমিত । বিশেষতঃ হিন্দি ভাষায় ! রাহুল-জীর্ন কিরাট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও জ্ঞান-গর্ভ প্রবু-রাজি প্রায়ই হিন্দি ভাষায় লিখিত । কোন ভাষায় এত স্বল্প জ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-তত্ত্ব সাধারণতঃ পঠন-লিখন হয় না । তথাপি সমুদ্র দর্শনে কুপ-মণ্ডকের লক্ষ-বিক্ষেপে ন্যায় আমার কীং আগ্রহ । আমি এই পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ করেছি বটে ; কিন্তু অনুবাদের যা নিয়ম, আমা-দ্বারা তা হয় নি । আকস্মিক, ভাবার্থিক কিংবা ব্যাখ্যা-মূলক অনুবাদের কোন দিকই সঠিকভাবে রক্ষিত হয় নি । অনুবাদ পার্থে আমি সর্বদা ষোড়শবার সুরিধার দিকেই লক্ষ্য রেখেছি । তথাপি বস্তুযান, তত্ত্বযান, মন্ত্রযান, সংজ্ঞাযান, কাল চক্রযান সম্পর্কিত এমন সব পারিভাষিক শব্দ আছে যা আমি নিজেও বুঝি মি । সর্ব বিষয়ের সঠিক বিবরণ দিতে গেলে সীমিত সময় সাপেক্ষ ও বহু খাটুনির প্রয়োজন । পুস্তিকাটি আকারে সিতান্ত

ছোট বটে ; কিন্তু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় অতীব গভীর । একে সর্বদা-  
স্থলর ও সহজ-বোধ্য করতে হলে ভূমিকার কলেবর বিরাট হয়ে দাঁড়ায় ।  
তাতে আবার আর্থিক সমস্যার প্রশ্ন ।

প্রকাশনার উদ্দেশ্যে, সরকারী অনুমতি লাভের আবেদন না করে  
দু'বৎসর পূর্বে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়া হয়েছিল । বাংলাদেশ  
বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সমিতি তথা এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার বাংলাদেশ জাতীয়  
কেন্দ্রের সহ-সভাপতি মাননীয় শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাশয়ের এই পুস্তক প্রকাশের  
জন্ত এক শত টাকা দান করেছিলেন । তাতে পুস্তকের কিয়দংশ মুদ্রিতও  
হয়েছিল । সরকারী অনুমতি ভিন্ন এই পুস্তক বের করা যুক্তি সঙ্গত হবে না  
বিশ্লেষণে পাণ্ডুলিপি প্রেস থেকে ফেরৎ নিয়ে আসি এবং সম্প্রতি সরকারী  
অনুমতি লাভ করে পুনরায় প্রেসে দিয়েছি ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক পূজনীয়  
মহাস্থবির শীলাচরণ শাস্ত্রী মহোদয়, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সমিতি তথা  
এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক  
শ্রীযুক্ত বাবু বিমলেচন্দ্র বড়ুয়া ও সমিতির চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতি  
শ্রীযুক্ত বাবু বিজুতি ভূষণ বড়ুয়া মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন  
ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেছেন । রাউজান নিবাসী মাষ্টার ( সিলেট  
বাদশাগঞ্জ পাবলিক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ) শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র লাল  
বড়ুয়া মহাশয় কিছু দিন পূর্বে বাদশাগঞ্জ থেকে এই পুস্তকের আংশিক খরচ  
বাবং একশত টাকা পাঠিয়েছেন ।

চট্টগ্রাম-কোটের পার নিবাসী ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার মাতৃ-দেবী শ্রীমতি  
বিমলাময়ী বড়ুয়া-ভাঁড়ার স্বামী স্বর্গীয় মাষ্টার শ্রীমন্ত বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতি স্মরণার্থ  
এই পুস্তকের সম্পূর্ণ ব্যয়-ভার বহন করে ধর্মদানের অধিকারিনী হলেন ।  
ধর্মদানং সর্বদানং জিনাতি । বুদ্ধ বাক্যের অন্তর্নিহিত সার—ধর্মদান অপর  
সব দানকে জয় করে ।

যারা এই পুস্তকের অনুবাদ কার্যে ও প্রকাশনার নানাভাবে সাহায্য করেছেন, আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের “ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতন” পুস্তিকাটি পাঠ করে সমাজ যদি সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল, কেনই বা অপসারিত হয়ে গিয়েছিল, ভারত-বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি বা কিরূপ? তবেই অনুবাদ কার্যের পরিশ্রম ও প্রকাশনার ব্যয়-ভার সফল হয়েছে মনে করব।

সকল সত্তা ভবন্ত সুখিত’স্তা।  
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক

শ্রী জ্যোতিঃ পাল মহাশয়ের

অধ্যক্ষ,

বরইগাঁও পালি পরিবেশ,

পোঃ—ভোরা জগৎপুর

লাকসাম, কুমিল্লা।

মধু পুণিমা, ২৫২৩ বুদ্ধাব্দ

১৯৭২ ইং

- নামো বুজায়

## ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতন

বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি হয় ভারতবর্ষে। ইহার প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ কোসী-কুরু-ক্ষেত্রে ও হিমাচল বিক্যাচলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিচরণ পূর্বক ৭২ বৎসর ব্যাপী ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই ধর্মের অনুসারী মহান সম্রাটগণ হতে আরম্ভ করে সাধারণ লোকজনের মধ্যে পর্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ সমগ্র ভারত বর্ষে বপুলাকারে ইহা বিস্তার লাভ করেছিল। ধর্মের সাধক ভিক্ষুদের মঠ-মন্দির ও বিহার ছাড়া দেশের খুব বিরল অংশই রিক্ত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের বিচারক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ হাজার হাজার বৎসর যাবৎ আপন বিচার-প্রভাবে ভারতীয় বিচারকে প্রভাবান্বিত করেছিল। এই ধর্মের শিল্পকলা বিশারদগণ ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যে অপরিমিত ছাপ রেখেছিলেন। এই ধর্মের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিদ্যার পারদর্শীগণ হাজার হাজার বর্ষ পর্যন্ত সজীব পর্বত বন্ধকে মোমের মত কর্তন করে অজন্তা, ইলোরা, কাল্‌ ও নাসিক প্রভৃতি গুহা-মন্দিরগুলো যে অত্যশ্চর্যভাবে প্রস্তুত করেছিলেন তার গভীর তাৎপর্য অবগত হওয়ার জন্য যখন ও চীনাদের মত সমুন্নত জাতি আগ্রহান্বিত হতে ছিলেন। এই ধর্মের দর্শন ও সদাচার সম্বন্ধে নিয়ম নীতিকে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সমগ্র বিদ্বান ব্যক্তি অতীব শ্রদ্ধা-যুক্ত দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এই ধর্মের অনুসারীর সংখ্যার সাথে তুল্য অন্য কোন ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা আজও বিদ্যমান নেই।

এরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি শালী বৌদ্ধ ধর্ম আপন মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হতে কিরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেল? ইহা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উপর আমি এখানে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্তরূপে বিচার করব। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ সাধন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক

থেকে আরম্ভ হয়েছে। এ সময়ের স্থিতি কাল অবগতির জন্ত কতক প্রাচীন ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটেছে—খৃষ্ট-পূর্ব ৪৮৩ অব্দে (স্থবির বাদীর মতে ৪৯৫ অব্দে)। তিনি সমগ্র ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন মৌখিক। শিষ্যগণ তাঁর জীবদ্দশায়ই তা কঠিন করে নিয়েছিলেন। এই উপদেশ ছিল দ্বিবিধ— (১) সাধারণ ধর্ম ও দর্শন এবং (২) ভিক্ষুভিক্ষুণী গণের নিয়ম নীতি; প্রথমোক্ত উপদেশকে পালিতে বলা হত—ধম্ম (ধর্ম)। দ্বিতীয়ত বিনয়। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁর প্রধান শিষ্যবৃন্দ ভবিষ্যতে মতভেদের আশঙ্কায় সেই বৎসরেই রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হয়েছিলেন এবং ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন করেছিলেন। এই সম্মেলনকে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়—প্রথম সঙ্গীতি। ইহাতে ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রধান মহাক্ষত্রপের বিচক্ষণ পরিচালনায় বুদ্ধের অনুচর-শিষ্য আনন্দ স্থবিরকে ধর্ম বিষয়ক ও বুদ্ধ প্রশংসিত উপালি স্থবিরকে বিনয় বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা-পূর্বক ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন করা হয়েছিল। অহিংসা, সত্য, অচোর্য, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি সংকর্মকে পালি ভাষায় বলা হয়—শীল। রূপাদি স্বক, চক্ষু বিজ্ঞানাদি আয়ত্তন, পৃথিবী জল ইত্যাদি ধাতুকে সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণে প্রজ্ঞা, দৃষ্টি বা দর্শন বলা হয়। বুদ্ধের উপদেশে শীল ও প্রজ্ঞা—এই দুই বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ জোর দেওয়া হয়েছিল। ধর্ম শব্দের আরেকটি প্রতি শব্দ পালি ভাষায় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে—সূত্র, সূক্ত সূত্র কিংবা সূত্রাস্ত। প্রথম সঙ্গীতি কারক স্থবিরগণ এই প্রকারে ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ করে ছিলেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন ভিক্ষু এই ধর্ম বিনয় পৃথক ভাবে কঠিন করে অধ্যয়ন অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। এভাবে তাঁরা ধর্ম বা সূত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন,—তাঁরা ধর্মধর, সূত্রধর বা সৌত্রান্ত্রিক নামে এবং তাঁরা বিনয় সংরক্ষণের ভার নিয়েছিলেন, তাঁরা বিনয়-ধর নামে অভিহিত হতেন। তদতিরিক্ত সূত্রে দর্শন সম্পর্কিত অংশটুকু কোন কোন ক্ষেত্রে বড়ই সংক্ষিপ্ত রূপে ছিল, —তা মাভিকা নামে কথিত। মাভিকা রক্ষক, মাভিকা-ধর নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে এই মাভিকাগুলো বিশদ রূপে বোধগম্যের জন্ত যখন বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়, তখন ইহা অভিধর্ম নাম ধারণ করে। ইহার সংরক্ষকগণ আভিধার্মিক নামে কথিত।



প্রথম সঙ্গীতির একশত বৎসর পরে খৃষ্ট পূর্ব: ৩৮৩ অব্দে বৈশালীর ভিক্ষুগণ বিনয়ের কিছু নিয়মের অবহেলা করতে শুরু করলেন। ইহা অবলম্বনে বিবাদে সূত্রপাত হয়। অতঃপর ভিক্ষু-সঙ্ঘ পুনরায় একত্রিত হ'য়ে বিবদমান বিষয়ের উপর আপন আপন মত প্রকাশ করলেন এবং ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন করলেন। এই সম্মেলনের নাম দ্বিতীয় সঙ্গীতি। কিছু সংখ্যক ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে একমত হতে পারলেন না। তাঁরা কৌশম্বীতে মহাসঙ্ঘ নাম দিয়ে পৃথক সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং আপন আপন মতানুসারে ধর্ম-বিনয় সংগ্রহ করলেন। সঙ্ঘস্থবিরের অনুগামী ব'লে প্রথম নিকায় আর্য-স্থবির বা স্থবিরবাদ নামে আর দ্বিতীয় নিকায় মহাসাংঘিক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল। এই দুই সম্প্রদায় প্রথম সোয়া শত বৎসরের মধ্যে স্থবিরবাদ সম্প্রদায় হতে বজ্জি-পুত্রক, মহীশাসক, ধর্ম গুপ্তিক, সম্মিতীয়, পাল্লাগারিক, ভদ্র-যানিক, ধর্মোত্তরীয় এবং মহাসাংঘিক সম্প্রদায় হতে গোকুলিক, এক বাবহারিক, প্রজ্ঞপ্তিবাদ (লোকোত্তরবাদ) বাহুলিক, চৈত্যবাদ—এই ১৮ প্রকার নিকায়ের উদ্ভব হল। তাদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ ছিল বিনয় ও অভিধর্মকে ভিত্তি ক'রে। কোন কোন নিকায় আর্য স্থবিরের স্থায় বুদ্ধকে মানুষরূপে না মেনে অলৌকিকরূপে মানতে লাগলেন। বুদ্ধের মধ্যে অদ্বৈত ও দিব্য শক্তির সন্নিবেশ স্বীকার করতেন। কেহ কেহ শুধু বুদ্ধের জন্ম ও নির্বাণ সম্পর্কিত বাহ্যাদৃশ্যের আশ্রয় করতেন। এভাবে বুদ্ধকে বিভিন্ন চক্ষে বিভিন্ন ভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়ার ফলে তাঁর সূত্র ও বিনয়ের মধ্যেও নানা পার্থক্য দেখা যেতে লাগল। বুদ্ধকে মানবাতীত লীলার অভিনেতারূপে স্বীকার করায় নব নব সূত্রের রচনা হয়েছিল। বুদ্ধের নির্বাণের প্রায় সোয়া দুইশত বৎসর পর সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গুরু মোগগলি-পুত্র তিস্য সেই সময় আর্যস্থবির পন্থীদের সঙ্ঘ-স্থবির ছিলেন। তিনি ভিক্ষুদের মধ্যে মতভেদ নিরসন করে পাটনায় অশোক নির্মিত অশোকারাম বিহারে ভিক্ষু-সঙ্ঘ কর্তৃক মনোনীত হাজার ভিক্ষুর এক সম্মেলন আহ্বান ক'রেছিলেন। তাঁরা মিলে বিবদমান বিষয় নির্ণয় ও ধর্ম বিনয় সংগ্রহ ক'রেছিলেন। এই সম্মেলন বৌদ্ধ শাস্ত্রে তৃতীয় সঙ্গীতি নামে প্রসিদ্ধ। এ সময় আর্যস্থবিরবাদ থেকে উদ্ভূত সর্বাতিবাদ নিকায়ের এক পৃথক সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় নালন্দায়। বুদ্ধ মাঝে মাঝে নালন্দায় অবস্থান করতেন ব'লে নালন্দা পবিত্র তীর্থ স্থানরূপে

গণ্য হয়ে গিয়েছিল এবং এই সময় নালন্দা সর্বাঙ্গী বাদীর মুখ্য স্থানে পরিণত হয়েছিল।

তৃতীয় সঙ্গীতি সমাপ্ত করার পর মোগ্গলি পুত্র তিব্বত সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বিভিন্ন দেশে ধর্ম প্রচারক পাঠিয়ে ছিলেন। সাংগঠনিক ভাবে ভারতীয় ধর্ম বহির্ভারে যে প্রচারিত হয়েছিল,—এটাই ছিল সর্ব প্রথম অভিযান। এই ধর্ম অভিযাত্রী দল পশ্চিমে গ্রীস, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ; উত্তরে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণে তাম্রপর্ণী (শ্রীলঙ্কা) ও সুবর্ণ ভূমি (বার্মা, শ্রাম) পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। শ্রীলঙ্কায় অশোকের পুত্র তথা মোগগলি পুত্র তিব্বতের শিষ্য ভিক্রম মহেন্দ্র ও তাঁর সহোদরা সজ্জ-মিত্রা ধর্ম প্রচারার্থ গমন করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার রাজা দেবানং প্রিয় তিব্বত তখন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে সেখানকার সমগ্র জনগণই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর্য স্থবির বাদের প্রচার প্রতিষ্ঠা তখনও সেখানে চলতেছিল। মাঝে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে যখন বার্মা ও শ্রাম দেশে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম বিকৃত জর্জরিত ও হ্রাস প্রাপ্ত হতে লাগল। তখন আর্য স্থবিরবাদ সেখানেও পৌঁছল। শ্রীলঙ্কায়ই খৃষ্টীয় প্রথম শতকে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম তিন পিটক—ত্রিপিটক বা কঠস্থ করার রীতি চলে আসছিল; তা লিপিবদ্ধ হল; ইহাই আধুনিক পালি ত্রিপিটক নামে বিখ্যাত।

মৌর্য সম্রাট বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অতীব অনুরক্ত ছিলেন। এ জন্য তাঁর জীবদ্দশায় অনেক পবিত্র তীর্থ স্থানে হাজার হাজার স্তূপ সজ্জারাম নিমিত্ত হয়েছিল। শ্রেষ্ঠীগণও বড় বড় স্তূপ সজ্জারাম তৈয়ার করেছিলেন, যেখানে ভিক্রম গুণ মুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বসবাস পূর্বক ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকে মৌর্য সেনাপতি পুষ্যমিত্র অস্তিম মৌর্য সম্রাট ( বৃহদ্রথ ) কে হত্যা করে নিজেকে রাজ্যাধিপতি ঘোষণা করেন এবং শুঙ্গ-বংশের রাজ্য স্থাপন করেন। এই নূতন রাজ বংশ রাজ-নৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিচারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অকৃত্রিম অনুসারী ও অব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিদ্রোহী ছিলেন। বহু শতাব্দীর পরিত্যক্ত পশু বলিময় অশ্ব-মেধাদি যজ্ঞ মহাভাগ্যকার পতঞ্জলীর পৌরহিত্যে পুনরায় অনুষ্ঠিত হতে লাগল।

ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্যো পরিপূর্ণ মনু, ঋতি প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। এই সময় মহাভারতের প্রথম সংস্করণ হয় তথা মৃত সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার করা হয়। পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় ঘরে আবদ্ধ বৌদ্ধ জনগণ বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রসমূহ মগধ ও কোশল থেকে বিভিন্ন দেশে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হতে লাগল। আর্য-স্ববির বাদ মগধ থেকে স'রে বিদিশার নিকট চৈত্য পর্বতে ( বর্তমান সাঁচী ) চ'লে গিয়েছিল। সর্বাঙ্গ-বাদ মথুরার উরু মুণ্ড পর্বতে ( গোবর্দ্ধন ) চ'লে গেল। এই প্রকারে অন্যান্য নিকায়সমূহ ও নিজ নিজ কেন্দ্র অন্যত্র হঠাতে বাধ্য হল।

স্ববিরবাদ হচ্ছে সবচেয়ে পুরানা নিকায় এবং প্রাচীন নীতিতে বড়ই কড়াকড়ি ভাবে সুরক্ষিত। অন্যান্য নিকায়গুলো দেশ, কাল ও ব্যক্তি ইত্যাদি বিবেচনানুসারে অনেক পরিবর্তন করেছিল। আজ পর্যন্তও ত্রিপিটক মাগধী ভাষায় রয়েছে, যা উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ ও বিহারের সাধারণ ভাষা ছিল। সর্বাঙ্গ বাদীরা মথুরায় পৌঁছেই আপনাদের ত্রিপিটক শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ প্রশংসিত সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তিত করেছিলেন। এরূপে মহাসক্তিক, লোকোত্তরবাদ আরো কয়েকটি নিকায় ও ত্রিপিটক সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করলেন। আজকাল ইহাকে গাথা সংস্কৃত বলা হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার পর যবনরাজ মিনান্দ্র পশ্চিম ভারত অধিকার করেছিলেন। মিনান্দ্রর আপনার রাজধানী সাকলায় ( বর্তমান শিয়ালকোট ) স্থাপন করলেন। তিনি ও তাঁর বংশজ কত্রেপ রাজারা মথুরা ও উজ্জয়িনীতে অবস্থাপনপূর্বক রাজ্য শাসন করতে। যবন রাজারা অধিকাংশ বৌদ্ধ ছিলেন। সে জন্য উজ্জয়িনীর কত্রেপ সাঁচীর স্ববির বাদীদের প্রতি এবং মথুরার কত্রেপ সর্বাঙ্গবাদীদের প্রতি বহু স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। এই সময়ে মথুরা কত্রেপের একমাত্র রাজধানীই ছিল না, অধিকন্তু এই মথুরা পূর্ব ও দক্ষিণ থেকে তক্ষশিলার বাণিজ্য পথে পথচারী লোকের প্রধান কেন্দ্র ও ব্যবসায়ের এক সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। এ জন্য সর্বাঙ্গ বাদের প্রচার কার্যের জন্য ইহা বড় সহায়ক হয়েছিল। মগধের সর্বাঙ্গবাদে আর

এখানকার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এজন্য এখানকার সর্বাস্তিবাদ আর্য সর্বাস্তিবাদ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

যখনদিগকে পরাস্ত ক'রে শকেরা পশ্চিম ভারত অধিকার করলেন। তাঁদের এক শাখা ছিল কুষাণ সেই কুষাণ বংশে প্রতাপশালী সম্রাট কনিষ্কের জন্ম হয়। কনিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষ পুর বা বর্তমান পেশোয়ার। এই সময় সর্বাস্তিবাদ গান্ধারে গিয়ে পৌঁছল। কনিষ্ক স্বয়ং সর্বাস্তিবাদের অনুসারী ছিলেন। এই সময়ে মহাকবি অশ্বঘোষ ও আচার্য বশুমিত্র প্রভৃতি জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই সময় গান্ধারের সর্বাস্তিবাদ যা মূল সর্বাস্তিবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল,—তা নিয়ে কাশ্মীর ও গান্ধার দেশীয় আচার্যদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। দেব পুত্র কনিষ্কের সহায়তায় বশুমিত্র, অশ্বখোষ প্রভৃতি আচার্য-গণ সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক মহতী সভা আহ্বান করলেন। এই সভায় আপোষে মতভেদ নিরসন করার মানসে তাঁরা আপন ত্রিপিটকের উপর বিভাষা নামী একটীকা লিখেছিলেন। এই বিভাষার অনুসারী হওয়াতে মূল সর্বাস্তিবাদীর আরেক নাম হয়—বৈভাষিক। বৌদ্ধ ধর্মে দুঃখ থেকে মুক্তি পথের ব্যতীতদের জন্য নির্বাণের তিনটি রাস্তা নির্দেশিত হয়েছে। (১) যিনি শুধু স্বয়ং দুঃখ-মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন এবং আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গে আক্লিষ্ট হয়ে জীবনমুক্তিলাভ করেন,—তিনি অহং ( অরিকে যিনি হত্যা করেছেন ) নামে অভিহিত। (২) যিনি তদপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম করতে প্রস্তুত হন এবং সাধনা-প্রভাবে জীবনমুক্তি লাভ করেন,—তিনি প্রত্যেক ( একক ) বুদ্ধ এবং (৩) যিনি শুধু আপন মুক্তির জন্য নহে, সর্ব জীবের পথ প্রদর্শক হওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করেন এবং বহুকাল পরে সেই মার্গ দ্বারা স্বয়ং প্রাপ্য নির্বাণ উপলব্ধি করেন, তিনি সম্যক সমুদ্ব নামে বিখ্যাত। এই তিন রাস্তাই যথাক্রমে অহং বা শ্রাবক-যান, প্রত্যেক বুদ্ধযান ও সম্যক সমুদ্ব নামে কথিত। কোন কোন আচার্য প্রথমোক্ত দ্বিবিধ যান অপেক্ষা বুদ্ধ যানের উপর বড় জোর দিয়েছিলেন এবং ইহা মহাযান। এরূপে পরবর্তী কালে কিছু সংখ্যক লোক প্রথমোক্ত দুই যানকে স্বার্থ-পূর্ণ বলে শুধু বুদ্ধযান বা মহাযানের প্রশংসা করতে লাগলেন। একথা স্বরণ থাকা

প্রয়োজন যে, পূর্বোক্ত ১৮ প্রকার নিকায় এই ত্রিবিধ যান স্বীকার করতেন । তাঁদের বক্তব্য ছিল যে কোন যান নির্বাচন করা যুমুক্ষু ব্যক্তির আপন স্বাভাবিক ক্রটির উপর নির্ভরশীল ।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে যে সময় বৈভাষিক সম্প্রদায় আর্থাবর্তে বিস্তার লাভ করতেছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভ ( বর্তমান বরার ) রাজ্যে আচার্য লাগাজুনের আবির্ভাব ঘটে । তিনি মাধ্যমিক বা শূন্য বাদ দর্শনের উপর গ্রন্থ লিখেছিলেন । কালান্তরে মহাযান ও মাধ্যমিক দর্শনের যোগে শূন্যবাদী মহাযান সম্প্রদায় চলতে থাকে । যেই ত্রিপিটকের আবশ্যিকতা মাঝে মাঝে উপলব্ধ হয়ে অষ্ট সাহস্রিক। প্রজ্ঞা-পারমিতা প্রভৃতি গ্রন্থ পুরণ ক'রে-ছিল । চতুর্থ শতকে পেশোয়ারের আচার্য বসুবন্ধু বৈভাষিক থেকে কিছুটা মতভেদ ক'রে অভিধর্ম-কোষ নামে গ্রন্থ লিখেছিলেন । তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর অশঙ্গ বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন । এক্ষেপে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধেরা বৈভাষিক সৌতাস্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চার দার্শনিক সম্প্রদায়রূপে গঠিত ও রূপান্তরিত হয় । তন্মধ্যে প্রথম দুই সম্প্রদায়কে যারা মানতেন, তারা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ যানকে মানতেন । এ জন্য তাঁদেরকে মহাযান পন্থীরা হীন যাপের অনুসারী বলতেন এবং অবশিষ্ট দ্বিবিধ সম্প্রদায় যুদ্ধ যানকেই মানতেন । তদ্ব্যতীত তারা আপনাদিগকে মহাযানপন্থী বলতেন ।

মহাযান পন্থীরা বুদ্ধযানের একান্ত ভক্ত ছিলেন । শুধু তা-ই নহে, অধিকন্তু তারা আপন আগ্রহাতিশয্যে অবশিষ্ট দ্বিবিধ যানকে ভাল-মন্দ বলতেও কুহিত হতেন না । বুদ্ধের আলৌকিক চরিত্র তাঁদের কাছে বহু উপযুক্ত মনে হত । এ জন্য তারা মহাযানাত্মিক ও লোকোক্তার বাদীদের অনেক মত গ্রহণ করছেন । রত্ন-কুট ও বৈপুল্য নামক বহু সূত্রও তাঁদের দ্বারা রচিত হয়েছে । বুদ্ধ যানের উপর উক্তরূপে আকৃষ্ট বুদ্ধ লাভের অধিকারী প্রাণীকে বোধিসত্ত্ব বলা হয় । মহাযানের সূত্রগুলোর মধ্যে প্রত্যেককে বোধি সত্ত্বের মার্গানুযায়ী চলবার জন্ত বিশেষ ছোর দেওয়া হয়েছে । প্রত্যেকের আপন মুক্তিলাভের ব্যয় না ক'রে অগ্রেই সকল প্রাণীর মুক্তির

জন্ত প্রযত্ন করা কর্তব্য বলে বিবেচিত। বোধিসত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্ত যেখানে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, আকাশ মার্গী প্রভৃতি শত শত বোধিসত্ত্বের কল্পনা করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সারিপুত্র, মোদগল্যায়ন প্রভৃতি মুক্ত অর্হং শিষ্যগণকে অমুক্ত ও বোধিসত্ত্বরূপে প্রতীয়মান করা হয়েছে। ইহার সারাংশ এই যে, যে সকল প্রাচীন সূত্র ইত্যাদি পরম্পরাকে আঠার প্রকার নিকায় ব'লে স্বীকৃতি দিয়ে আসতেছিল, মহাযান পন্থীরা সেই সকলকে বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ করবার প্রবণতায় একেবারে বিপরীত সাধনে কোনরূপ ক্রটি করেন নি।

কনিস্কের সময় অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্বাণের চার শত বৎসর পরে সর্ব প্রথম বুদ্ধ-মূর্তি নির্মিত হয়েছে। মহাযান ধর্ম প্রচারের সাথে যে ক্ষেত্রে বুদ্ধ প্রতিমার পূজাচনার বাহুল্য জা'ক জমকপূর্ণ আকার ধারণ করে, সে ক্ষেত্রে শত শত বোধিসত্ত্বের প্রতিমা নির্মিত হতে লাগল। তাঁরা ব্রাহ্মণদের দেব-দেবীর স্তায় এই সকল বোধি সত্ত্বের নিকট কামনা পূর্ণ করার জন্য সমর্পণ করতেন। তাঁরা প্রজ্ঞা পারমিতা, তারা প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর কল্পনা করেছিলেন। স্থানে স্থানে এই দেবদেবী ও বোধিসত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য অতীব বিশাল মন্দির প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁদের বহু স্তোত্রাদি রচনাও হতে লাগল। এ সম্পর্কে এই সব লোকের এরূপ কল্পনাও আসে নি যে, তাঁদের এই কার্ষ-কলাপে প্রাচীন পরম্পরা ও ভিক্ষু নীতির উল্লঙ্ঘন হতে চলছে। যখন কেহ কোনরূপ প্রামাণ্য দলিল প্রদর্শন করেছে,—অমনি তাকে ব'লে দেওয়া হয়েছে যে, বিনয়ের নিয়ম নীতি হচ্ছে,—তুচ্ছ স্বার্থের পিছনে মরনেওয়ালা হীন যান পন্থীদের জন্য। সমগ্র জগতের মুক্তির জন্য জীবনে মরণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বোধিসত্ত্বের নিকট ঐ জাতীয় কোনরূপ অন্তরায় আসতে পারে না। মহাযান পন্থীরা হীনযানী সূত্র অপেক্ষা আপনাদের অধিকতর মাহাত্ম্য পূর্ণসূত্র প্রস্তুত ক'রেছিলেন। শত শত পৃষ্ঠার সূত্র-সমূহ পাঠ করা খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে না। এ জন্ত তাঁরা প্রত্যেক সূত্রের দু'তিন পংক্তিতে ছোট ছোট ধারণী প্রস্তুত ক'রেছিলেন, যেমন ভাগবতের চতুঃশ্লোকী ভাগবত, গীতার সপ্তশ্লোকী গীতা। এই ধারণী-গুলোকে আরো সংক্ষিপ্ত ক'রে মন্ত্রের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই প্রকারে ধারণী, বোধিসত্ত্ব ও তাদের অনেক দিব্য শক্তি, প্রাচীন পরম্পরা এবং

পিটকীয় নিয়ম নীতির ওলট-পালটে নিঃসঙ্কোচ উৎসাহ সৃষ্ট হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক কাল থেকে হর্ষ বর্দ্ধনের সময় পর্যন্ত মঞ্জুশ্রী মূলকল্প, গুহ্য-সমাজ ও চক্র-সংবরণ ইত্যাদি অনেক তন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। পুরানা নিকায় সমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সরলতার সহিত আপন মুক্তির উদ্দেশ্য অর্হংযান ও ঐত্যোক বুদ্ধ যানের রাস্তা উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। মহাযান পন্থীরা সকলের জন্ত সুদৃশ্য বুদ্ধ-যানেরই একমাত্র রাস্তা করে রেখেছিল। ভবিষ্যতে তার কঠোরতাকে দূর করার জন্ত তাঁরা ধারনী ও বোধিসত্ত্বের পূজার বিধি আবিষ্কার করেছিলেন। এই প্রকারে যখন সরল সহজ দিকের মার্গ খুলতে লাগল তখন তার আবিষ্কারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। মঞ্জুশ্রী মূলকল্প তন্ত্রের জন্ত উপায় উদ্ভাবন করে দিল। গুহ্য-সমাজ আপন ভৈরবী-চক্রের শরাব, স্ত্রী-সংভোগ তথা মস্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আরো সরল সহজ করেছিল। এ সব মতবাদ মহাযানের ভিতর থেকেই বের হল। কিন্তু প্রথমতঃ ইহার প্রচার ভিতরে ভিতরেই চলতে ছিল। ভৈরবী-চক্রের সব কারবার গোপন রাখা হয়েছিল। প্রবেশাকাজক্ষীকে কত সময় পর্যন্ত যে উমেদারী করতে হত। অনেক শিক্ষা-দীক্ষা ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঐ ব্যক্তি সে-সমাজে মিলিত হতে সক্ষম হত। এই মন্ত্রযান (তন্ত্রযান, বজ্রযান) সম্প্রদায় এই প্রকারে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত রীতিতে চলে এসেছিল। ইহার অনুসারীরা বাহ্যিক ভাবে নিজেদের মহাযানী আখ্যায় প্রকাশ করতে লাগল। মহা যানীরা আপনাদের পৃথক বিনয় পিটক তৈয়ার করতে পারে নি। এ জন্ত এই পন্থার ভিক্ষুগণ সর্বাঙ্গীভাব ইত্যাদি নিকারে দীক্ষা দিতে শুরু করলেন। অষ্টম শতাব্দীতেও যখন নালন্দা মহাযানীদের কেন্দ্র ছিল, সেখানকার ভিক্ষুরা সর্বাঙ্গীভাবের বিনয়ের অনুশীলন করতেন। সেখানকার ভিক্ষুদিগকে সর্বাঙ্গীভাবের বিনয়ানুসারে মহাযানের বোধিসত্ত্ব চর্চার বিধান এবং বজ্রযানের ভৈরবচক্র-মতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হত।

অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায় এক প্রকার বজ্রযান গবিত মহাযানের অনুসারী হয়ে গিয়েছিলেন। বুদ্ধের সাদা-সিঁধে শিকার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। অধিকন্তু তাঁরা মন-গড়া হাজার

হাজার অলৌকিক কথায় বিশ্বাস করতেন। বাহ্যতঃ ভিক্ষুদের চীবর পরিধানের মধ্যেও তাঁরা ভিতরে ভিতরে গৃহ-সমাজী ছিলেন। বড় বড় বিদ্বান ও প্রতিভা-শালী কবি আধা-পাগল হয়ে, চৌরাশি সিদ্ধায় পরিণত হয়ে সান্ধ্য-ভাষায় নিগুন গান করতেন। অষ্টম শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্র-ভূতি এবং তাঁর গুরু সিদ্ধা অনঙ্গ-বজ্র এবং অগ্ন্যগ্ন পণ্ডিত-সিদ্ধা ত্রীলোকদিগকে মুক্তি-দাত্রী প্রজ্ঞা, পুরুষকে মুক্তির উপায়, শরাবকে অমৃত রূপে সিদ্ধ করার জন্য আপনাদের পাণ্ডিত্য ও সিদ্ধির আফালন জাহির করতেন। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বস্তুতঃ বজ্রযান বা ভৈরবী-চক্রের ধর্ম ছিল। মহা-যানের ধারনী ও পূজার্তনা দ্বারা নির্বাণকে সুগম করা হয়েছিল। বজ্রযান তো ইহাকে একেবারে সহজ করে দিয়েছিল। এ জন্য পূর্ববর্তী বজ্রযান পরবর্তী কালে সহজ যান নামে অভিহিত হতে লাগল।

বজ্রযান পন্থী বিদ্বান ও প্রতিভা-শালী কবি চৌরাশি সিদ্ধাগণ বিলক্ষণ বেশে বিচরণ পূর্বক অবস্থান করতেন। কেহ পন্থী বা পাছুকা তৈয়ার করতেন বলে পন্থী-পা, কেহ কবল দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে অবস্থান করতেন বলে কমরী-পা, কেহ ডমরু বাজাতেন বলে ডমরু-পা, কেহ বা ওখল বা কাষ্ঠ-নিমিত ( বাগ ) বস্ত্র রাখতেন বলে ওখরী-পা নামে অভিহিত হতেন। এ সব লোক ছিলেন মদ-মাতাল। মানুষের মাথার খুলি নিয়ে তারা শ্মশান কিংবা বনিকট জঙ্গলে বাস করতেন। জন সাধারণকে তাঁরা যতই শাসন করতেন, ততই লোক জন তাঁদের পিছনে ধাবিত হত। মানুষ বোধি সঙ্কেত প্রতিমা ও অগ্ন্যান্য দেব-দেবীর স্থায় এই সিদ্ধাগণকে অদ্ভুত ক্রমতা, দিবা শক্তি সম্পদে শক্তিশালী মনে করতেন। তাঁরা প্রকাশ্যভাবে স্ত্রী ও শরাব উপভোগ করতেন। রাজা মহারাজাগণ নিজ কন্যা পর্যন্ত তাঁদেরকে দান করতেন। এ সকল লোক ট্রাটক ( Hypnotism ) প্রক্রিয়ার কিছু অভ্যাস ছিলেন। এ সবে প্রভাবে আপনাদের অত্যন্ত সাদা-সিধে অনুসারী-গণকে কখন কখন কিছু কিছু ভৌতিক প্রদর্শন করতেন। কখন কখন হাতের ছাপাই তথা শ্লেষ-বুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠ স্বরে জনতার মধ্যে নিজেদের অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রকাশ করতেন। এই পাঁচ শত বৎসরে ধীরে ধীরে এক উন্নত সমগ্র ভারতীয়



জনগণ তাঁদের খপ্পরে পড়ে কাম-ব্যসনী, মদ্যপ ও অন্ধ বিশ্বাসী হয়ে গেল। রাজা মহারাজা যেখানে রাজ্য রক্ষার্থ পন্টন নিযুক্ত করেছিলেন, সেখানে কিছু সংখ্যক সিদ্ধাচার্য তথা তাঁদের শত শত তান্ত্রিক অনুসারী-গণের রক্ষার্থ বহু বায়-সাধ্য পন্টন মোতায়ন রাখতেন। দেব-মন্দিরে সর্বদা বলি-পূজা সম্পাদিত হত। লাভ-সংকার দ্বারা উন্মুক্ত হলে ব্রাহ্মণ ও অন্তর্ধর্ম্মানুসারীগণও বহুলাংশে তাঁদের অনুসরণ করতে লাগলেন।

ভারতীয় জনগণ যখন এই প্রকার ছুরাচার ও অন্ধ বিশ্বাসের গভীর পক্ষে আকর্ষণ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তখন ব্রাহ্মণেরা জাতি ভেদে পুঞ্জীভূত বিষ-বীজকে শত শত বর্ষ-ব্যাপী সেই জাতির মর্ম্মমূলে টুকরো টুকরো বাটরা করে ঘোরতর গৃহ-কলহের সৃষ্টি করে রেখেছিল। শত শত বর্ষ ব্যাপী শ্রদ্ধালু রাজা ও শ্রেষ্ঠীগণ শ্রদ্ধা দান করতে করতে মঠ-মন্দিরে অপার ধন-রাশি স্তুপাকার করে ছিলেন। এমন সময় পশ্চিম দেশীয় লোকেরা আক্রমণ শুরু করলেন। তাঁরা শুধু মঠ-মন্দিরের অপার ধন সম্পদই লুণ্ঠন করলেন না ; দিব্য-শক্তির মালিক অগণিত দেব-মুষ্টি ও চুবমার করে ফেলল। তান্ত্রিক লোকেরা মন্ত্র, তন্ত্র, বলি ও পূরস্চরন প্রয়োগ করতেই রইল ; কিন্তু এতে আক্রমণ কারীদের কোনরূপ বাধা দিতে পারল না। ত্রয়োদশ শতক আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী বীরেরা সমস্ত উত্তর ভারত আপনাদের হস্তগত করল। বিহারের পাল বংশীয় রাজারা রাজ্য রক্ষার্থ ওদন্ত পুরীতে এক তান্ত্রিক বিহার নির্মাণ করেছিলেন। মোহম্মদ বিন বক্তিরার মাত্র দুই শত অশ্বারোহী সেনা নিয়ে ইহা জয় করেছিলেন। নালন্দার অদ্বুত শক্তি-শালিনী তারা টুকরো টুকরো করে ফেলে দেওয়া হল। তলোয়ারের আঘাতে নালন্দা ও বিক্রম শীলার শত শত তান্ত্রিক ভিক্ষুর শিরচ্ছেদ করে তারা চলে গেল। যদিও এই যুদ্ধে অপার ধন-জ্ঞানের পরিহানি ঘটেছিল, অপার ঐশ্বর্য্য-ভাষীভূত হয়েছিল। শত শত শিল্প-কলার উৎকৃষ্ট আদর্শ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তথাপি এই যুদ্ধে একটা মস্ত বড় লাভ হল এই জন-গণের মন থেকে ভোজ-বাহির স্বপ্ন চিরতরে অপসারিত হয়ে গিয়েছিল।

বহু কাল থেকে একটা কথা চলে আসছে যে, শঙ্করাচার্যের প্রত্যাপেই বৌদ্ধেরা ভারত থেকে বহির্গমন করল। শঙ্কর শুধু শাস্ত্রার্থেই বৌদ্ধ দিগন্তে পরাস্ত করেন নি, অধিকন্তু তাঁর আশ্রায় রাজা মুঘল প্রভৃতি হাজার হাজার বৌদ্ধকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরে ছিলেন এবং তলোয়ার দ্বারা তাদের শিরচ্ছেদ-পূর্বক সংহার করিয়ে ছিলেন। এই কথা শুধু দস্ত-কথা—বা বাদকে বাদ নহে, এর সত্যতা আনন্দ গিরি ও মাধবাচার্যের ( শঙ্কর দিগ্বিজয় ) নামক পুস্তকে রয়েছে। তৎকাল সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বান এবং অন্ত শিক্ত লোকও এই কথায় বিশ্বাস করতেন এবং ইহাকে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্যরূপে মনে করতেন। আবার কিছু সংখ্যক লোক এতে শঙ্করের প্রতি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কলঙ্ক আরোপিত হয় দেখে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তা যদি সত্য হয়, তবে তাঁর অপলাপ না করাই উচিত।

শঙ্করের সময় কাল নিয়েও মত-বিরোধ আছে। কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে বিক্রমের সমকালীন মেনে থাকেন। Age of Sankar এর সম্পাদক ও পুরানাত্মসারে পণ্ডিতগণের ইহাই অভিমত। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এই মত মানেন না। তাঁরা বলেন,—শঙ্করের শারীরিক ভাষা নামক গ্রন্থের উপর বাচস্পতি মিশ্র ‘ভামতী’ টীকা লিখেছিলেন। বাচস্পতি মিশ্রের সময় হচ্ছে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী। তাঁর নিজ গ্রন্থের দ্বারাই তা প্রমাণিত। এ উক্ত শঙ্করের সময় যে নবম শতাব্দীর পূর্বে, তা নিশ্চিত। কিন্তু শঙ্কর কুমারিণ ভট্ট থেকে পূর্বের হতে পারেন না। কুমারিণ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম-কীর্তির সম-সাময়িক ছিলেন, যিনি সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তা হলে শঙ্কর সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক হতে পারেন না। শঙ্কর কুমারিণ ভট্টের সম-কালীন ছিলেন এবং দু’জনেই একে অন্যের সাক্ষাৎকার পেয়ে ছিলেন। এই কথা আমরা ‘দিগ্বিজয়’ থেকে পেয়ে থাকি। এতে অস্বস্তিকথা হল এই, তাঁর নিজ গ্রন্থের মাধ্যমে যতদূর জানা যায়, তাতে কোনরূপ প্রমাণ মিলে না।

হিউএন সাং ( সপ্তম শতাব্দী ) এর পূর্ববর্তী একরূপ কোন প্রবল বৌদ্ধ বিরোধী শাস্ত্রাখ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি পরিচয় পাওয়া যেত,

তবে হিউএন সাং অবশ্যই তাঁর ভারত বিবরণে তা লিপিবদ্ধ করতেন। যদি এই কথা বলা যায় যে, শঙ্করাচার্য ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে জন্ম পরিগ্রহ করে ছিলেন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্রও দক্ষিণ ভারতই ছিল। তবে দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধগণের উপর উপরোক্ত অত্যাচার হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই কথাও ঠিক নহে। কেননা, ষষ্ঠ শতাব্দীর পরেও কাঞ্চী-কাবেরী বন্দরে অবস্থানকারী আচার্য ধর্মপাল প্রভৃতি বৌদ্ধ পালি গ্রন্থকার আবির্ভূত হয়েছিলেন। যার কর্মতৎপরতার নিদর্শন আজও সিংহল প্রভৃতি দেশে স্মরিত আছে। সিংহলের ইতিহাস গ্রন্থ ‘মহাবংশ’ রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা ধর্মীয় ইতিহাসের অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শঙ্করাচার্যের জন্ম স্থান কেবল দেশ এবং ড্রাবিড় দেশ সিংহলের খুব নিকটবর্তী। যদি এরূপ কোন কথা সত্য হত, তবে মহাবংশে এ সম্পর্কে উল্লেখ না থাকার কোন রূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। বৌদ্ধ ঐতিহাসিক গণের লেখায় শঙ্করের শাস্ত্রার্থ পর মৌন থাকার প্রেক্ষিতেই এই কথার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই সকল ঘটনা বস্তুতঃ সংঘটিতই হয় নি। অধিকন্তু রামানুজ প্রভৃতির চরিত্রের মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে এরূপ ব্যবহার দেখে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

আসল কথা হল,—শঙ্করাচার্য দাক্ষিণাত্যে একজন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ‘শারীরক ভাষ্য’ নামক গ্রন্থ লিখে ছিলেন। সেই ভাষ্য এক নূতন বিষয় সম্পর্কিত ছিল এবং এতে বহু দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর যুক্তির অবতারণা ছিল। দিগুনাগ, উদ্যোতকর, কুমারিল, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের যুগে এরূপ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ আর ছিল না। এ সময়ে কেবল ও ড্রাবির দেশবাসীদের সঙ্গে উত্তর ভারতীয়দের বিরোধ ছিল। এই বিরোধ সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি যদি আমরা সপ্তম শতাব্দীর মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বীর সেই অংশটুকু পাঠ করি—যেই অংশে শবরের সাথে কোন এক জঙ্গলে বসে এক ড্রাবিড় ব্রাহ্মণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছিল। বস্তুতঃ উত্তর ভারতীয় পণ্ডিত মণ্ডলী, যারা সেই সময়কার অতি উচ্চদের পণ্ডিতমণ্ডলী ছিলেন; ততক্ষণ পর্যন্ত শঙ্করকে আচার্যরূপে মানবার জ্ঞান উদীচ্য ব্রাহ্মণগণ প্রস্তুত ছিলেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় দার্শনিক

পণ্ডিতদের প্রধান কেন্দ্র-মিথিলার সম-সাময়িক অদ্বিতীয় দার্শনিক, সর্বশাস্ত্র পারদর্শী বাচস্পতি মিশ্র শারীরক ভাষ্যের চীকা 'ভামতী' লিখে শঙ্করকে সঠিকরূপে উপলব্ধি করার যুক্তিসমূহ প্রদর্শন না করেছিলেন। বস্তুতঃ বাচস্পতির কাঁদে চড়েই শঙ্করের খ্যাতি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ,—যা আজ কাল দেখা যায়। যদি তিনি 'ভামতী' না লিখতেন, তবে শঙ্করের শারীরক ভাষ্য কবে উপেক্ষিত ও বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং আজ ভারতে শঙ্করের গৌরব ও প্রভাব প্রতিপত্তির কথাই বা কি? বাচস্পতি উত্তর ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে শঙ্করে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বাস্পতি মিশ্র হতে এক শতাব্দী পূর্বে নালন্দায় অচার্য শাস্ত্র রক্ষিত আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর মহান দার্শনিক গ্রন্থ 'ভঙ্ক সংগ্রহ' সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছে এবং বরোদা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ রত্নের মধ্যে শাস্ত্ররক্ষিত আপনার থেকে পূর্ববর্তী পঞ্চাশ জন দার্শনিক ও দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করে খণ্ডন-মণ্ডন করেছেন। যদি বাচস্পতি মিশ্র থেকে পূর্বেই শঙ্কর আপন বিদ্যাবস্তা ও দিগ্বিজয় দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়ে থাকেন, তবে কোন কারণ নেই যে শাস্ত্ররক্ষিত ইহার স্মরণ না করেন।

আরেকটা কথা বলা যায় যে—শঙ্কর বৌদ্ধদিগকে ভারত বর্ষ থেকে মেরে পিটে তাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই—গোড়দেশে (বিহার বাংলা) পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের প্রচণ্ড প্রতাপের বিস্তার এবং এই সময় উদন্তপুরী (বিহার শরীফ) ও বিক্রম শীলা যেমন বৌদ্ধ বিশ্ব বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি এই সময় ভারতীয় বৌদ্ধদের তিব্বতে ধর্ম-বিজয় করতেও আমরা দেখি। একাদশ শতাব্দীর পূর্বোক্ত প্রবাদানুসারে ভারতে যখন কোনও বৌদ্ধ থাকার কথা নয়, তখন তিব্বত থেকে কতিপয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁরা সব জায়গায় বৌদ্ধ ও ভিক্ষুগণকে দেখতে পেয়েছিলেন। পাল যুগের বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও তান্ত্রিক দেব-দেবীর হাজার হাজার খণ্ডিত মূর্তি উত্তর ভারতের গান্ধাতকের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। মগধ, বিশেষ করে, গয়া জেলার এমন গ্রাম খুব কমই দেখা যায়, যেখানে এ যুগের মূর্তি পাওয়া যায় না। গয়া জেলার জাহানাবাদ মহকুমায় কোন

কোন গ্রামে এই সকল মূর্তিতে ভরপুর। কেম্পা, ঘেঞ্জল ইত্যাদি গ্রামে তো অনেক বুদ্ধ, তারা, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির মূর্তি,—যাতে ঐ সময়কার কুটিল অন্ধরে “যে ধর্মা হেতু প্রভবা ” শ্লোকে অঙ্কিত প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে এ কথা বুঝা যায় যে, সেই সময় শঙ্কর বৌদ্ধদিগের কোন প্রকার ধ্বংস করেন নি বলেই এই সব সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল। এই কথা সারা উত্তর ভারতে প্রাপ্ত তাম্র-লেখ ও শিলা-লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয়। গোড়াধিপতি তো পশ্চিম দেশীয়দের বিহার বাংলা বিজয় পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম ও শিল্প কলার মহান সংরক্ষক ছিলেন। অস্তিম কাল পর্যন্ত তাঁর তাম্র-পট বুদ্ধ ভগবানের সর্ব প্রথম ধর্মোপদেশের স্থান যুগ-দাবের (সারনাথ) লাঞ্জন দুই যুগের মধ্যে রক্ষিত চক্র দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিল। গোড়-দেশের পশ্চিমে ছিল কাশ্মুকুজ রাজ্য। উহা যমুনা হতে গওক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানকার জনগণ ও নৃপতিগণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম খুব সম্মানিত ছিল। জয়চন্দ্রের দাদা গোবিন্দ চন্দ্রের জেতবন বিহার দান করে পঞ্চ গ্রামের দান পত্রের দ্বারা এবং তাঁর রাণী কুমার দেবীর নিগিত সার নাথের মহান বৌদ্ধ মন্দির দ্বারা প্রমাণিত হয়। গোবিন্দ চন্দ্রের পৌত্র জয়-চন্দ্রের এক প্রধানা রাণী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিনী ছিলেন। যার উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞা পারমিতা সম্প্রকিত লিখিত পুস্তক আজও নেপাল দর্বার পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। কনৌজে গহড়বার রাজাদের আমলের কত কত বৌদ্ধ-মূর্তি পাওয়া যায়, যা আজ কোন না কোন দেব-দেবতা-রূপে পুজিত হয়ে থাকে।

কালিঙ্গের রাজশূ বর্গের সময়ে নিমিত্ত মহোবা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত সিংহ-নাদ, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর মূর্তি দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তুর্কীদের আগমনের সময় পর্যন্ত বুদ্ধের মূর্তি খণ্ডে বৌদ্ধদের বিরাট সংখ্যা তথায় ছিল। দক্ষিণ ভারতে দেবগিরির (দৌলতাবাদ, নিজাম) পাশে ইলোরার বিখ্যাত গুহা প্রাসাদের মধ্যে কত কত বৌদ্ধ গুহা ও মূর্তি বা মলিক-কাফুর থেকে কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত নিমিত্ত হয়েছিল। নাসিকের পাণ্ডব লেনীর কিছু সংখ্যক গুহার সম্পর্কেও এ যুক্তি প্রযোজ্য। তবে কি একরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক নহে যে শঙ্কর দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের দেশ-

নিবাসন করনা মাত্র। খোদ শঙ্করের জন্ম-ভূমি কেরল হতে বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ তন্ত্র গ্রন্থ ‘মঞ্জুশ্রী-মূল কল্প’ সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়। যা ত্রিবেদ্যম্ হতে স্বর্গীয় মহা মহোপাধ্যায় গণ-পতি শাস্ত্রী প্রকাশিত করিয়েছিলেন। তবে কি এই গ্রন্থের প্রাপ্তিতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে সমগ্র ভারত হতে শঙ্কর দ্বারা বৌদ্ধদের বহিষ্কার একটা অমূলক কথা। খোদ কেরল থেকেও বৌদ্ধ ধর্ম বহু কাল পরে লুপ্ত হয়েছিল। এরূপ আরো অনেক যুক্তি আছে, যা এ সম্পর্কে পেশ করা যেতে পারে, যদ্বারা ইতিহাসের পূর্বোক্ত মিথ্যা ধারণা খণ্ডিত হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, তুর্কী বীরেরা তো বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়ের মন্দির ধ্বংস করেছিল, পুরোহিত গণকে হত্যা করেছিল। তবে কি কারণ আছে যে ভারতে ব্রাহ্মণ আজও বিদ্যমান আর বৌদ্ধ যে নেই বললেও হয়? কথা হল যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে গহস্ত ও ধর্মের পরিচালক হতে পারেন। বৌদ্ধ ধর্মে ভিক্ষুদের উপরই ধর্ম প্রচার ও ধর্ম গ্রন্থের রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্থাপ্ত। ভিক্ষুগণ আপন চীঘর ও মঠের নিবাস হতেই অনায়াসে চিহ্নিত হতেন। ইহাও একটি কারণ যে তুর্কীদের প্রারম্ভিক শাসন কালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবস্থান মুশ্কিল হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যদিও বামপন্থী ছিলেন, কিন্তু সবাই নহে। বৌদ্ধদের মধ্যে তো সবাই ছিলেন বজ্রযানী। এই ভিক্ষুদের প্রতিষ্ঠা তাদের সদাচার আদর্শ ও বিদ্যার উপর নির্ভর ছিল না। ছিল তাঁদের তথা-কথিত তন্ত্র মন্ত্র এবং দেবতাদের এই সব অদ্ভুত শক্তি ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর। তুর্কীদের তলোয়ার এই সব অদ্ভুত শক্তির দেওয়ান ধূলিসাৎ করেছিল। জন সাধারণ তখন হৃদয়ঙ্গম করতে লাগল যে ‘আমরা এতদিন ধোকা-বাজিতে ছিলাম’। এর ফল ফলল এই যে, যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিজেদের ধ্বংসীভূত মঠ মন্দির পুনরায় মেরামত করতে চেয়েছিলেন, তখন তজ্জ্ঞ তাঁদের অর্থ মিলল না। বস্তুতঃ এই সব হুঁচকার মদখোর ভিক্ষুদিগকে কে অর্থের ষলে সমর্পন করবে? যেহেতু তুর্কীদের অত্যাচার নিবন্ধন তখন লোকের নিকট একেকটি পরস্পর বহু মূল্যবান বলে অনুভূত হতে-ছিল। কলে বৌদ্ধরা আপনাদের ধ্বংস প্রাপ্ত ধর্ম স্থান সমূহ মেরামত করতে

সকল হতে পায়োন। তাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ-  
দের সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য নহে। তাঁদের মধ্যে সবাই অত্যাচারী  
ছিলেন না। তাঁদের বিদ্যা ও সদাচারের জন্য তাঁরা আপনাদের নঙ্গীকৃত  
মঠ-মন্দির পুনশ্চ: প্রভৃতির জন্য বহু অর্থ লাভ করেছিলেন। বারানসীর  
পাশে বৌদ্ধদের অতীব পবিত্র তীর্থস্থান খম্বিশতন মৃগদাব ( বর্তমান সারনাথ )  
সেখানকার খুদাই-করা লিপি থেকে এই প্রতীতি জন্মে যে, কান্য-কুজেশ্বর  
গোবিন্দচন্দ্রের রাণী কুমার দেবীর নিমিত্ত বিহার সেখানকার সর্বশেষ বিহার  
ছিল। তুর্কীরা যখন ইহা নষ্ট করে ফেলল, তখন তা পুনরায় নির্মাণের  
আর কোন ব্যয় নেওয়া হয় নি। এটার পদ্ধান্তরিক উদাহরণ,—বারানসীর  
বিশ্বনাথ মন্দির একে একে চার বার নব নব চূড়ায় নিমিত্ত হল। সব চেয়ে  
পুরানো মন্দির বিশেষর গাঞ্জের নিকট অবস্থিত ছিল, এখন যেখানে মসজিদ,  
সেখানে শিব-রাত্রি তিথিতে আজও মানুষ পূণ্য কামনায় জল সিঁধন করে  
থাকে। এটার ধ্বংসের পর যেই মন্দির প্রস্তুত হয়, তাকে বলা হয়—  
আদি বিশেষর। এটাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে জ্ঞানবাণীতে পুনশ্চ: নিমিত্ত হয়,  
যার ধ্বংসিত অংশ আতও ঔরঙ্গজেবের মসজিদের নিকট দেখতে পাওয়া  
যায়। এই মন্দির যখন ঔরঙ্গজেব নষ্ট করে ফেলেছিলেন, তখন বর্তমান  
মন্দিরটি নিমিত্ত হয়েছিল।

নালন্দা, ওদন্তপুরী, জেতবন ইত্যাদি বৌদ্ধ পবিত্র স্থানেও আমরা  
হাদেশ শতকের পরবর্তী দালান-কোটা দেখতে পাই না। লামা তারা নাথের  
ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, বিহারসমূহ ধ্বংস করে ফেলার  
পর বিহারের আবাসিক ভিক্ষুরা পলায়ন করে তিব্বত, নেপাল এবং অন্যান্য  
দেশে চলে গিয়েছিলেন। অল্প ধর্মাবলম্বীর ন্যায় হিন্দুদের থেকে বৌদ্ধদের  
পৃথক কোন জাতি ছিল না। একই জাতি আবার কি? একই ঘরে ব্রাহ্মণ-  
ধর্মী ও বৌদ্ধ উভয় মতের অনুসারীরা সহাবস্থান করতেছিলেন। এক  
দিকে নিজ ভিক্ষুদের অভাব, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ধর্মীদের দিকে আকর্ষণ,  
এমন কি, ব্রাহ্মণ ধর্মীরা বৌদ্ধদের সাথে রক্তের সম্বন্ধ গড়ে তুলতে ছিলেন।  
বৌদ্ধদের মধ্যে জোলা, ধুনিয়া প্রভৃতি কত কত নিরীহ নীচ জাত বলে

পরিচিত জাতিসমূহের প্রতি অন্য ধর্মাবলম্বীদের তরফ থেকে কখনো ভয়-ভীতি, কখনো প্রলোভন প্রদর্শনের মাধ্যমে আকর্ষণ করতে লাগল। এ সব কারণে ছ' এক শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধরা অধিকাংশ হয়ে গেল ব্রাহ্মণ-ধর্মী, নচেৎ মুসলমান।